

فقه الأولويات

ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

ড. ইউসুফ আল কারজাভি
সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান
অনূদিত



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

উম্মাহর জন্য অধাধিকার ফিকহ জানার থয়োজনীয়তা	১৭
◆ মুসলিম উম্মাহর জন্য অধাধিকার নীতি জানার থয়োজনীয়তা	২৪
◆ অধাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে আমাদের সংকট	২৪
◆ ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে অধাধিকার নীতির চরম ব্যত্যয়	২৭
অধাধিকার ফিকহের সাথে অন্যান্য ফিকহের সম্পর্ক	৪০
◆ ফিকহুল আওলাউইয়্যাতের সাথে ফিকহুল মুয়াজানাতের সম্পর্ক	৪০
◆ ইজজুদ্দিন বিন আবদুস সালাম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ	৪৭
◆ ইহ ও পরকালীন কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ নির্ণয়ের মানদণ্ড	৫১
◆ কাওয়াইদুল আহকাম গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য	৫১
◆ ফিকহুল আওলাউইয়্যাতের সাথে ফিকহুল মাকাসিদের সম্পর্ক	৫২
◆ ফিকহুল আওলাউইয়্যাতের সাথে ফিকহুল নুসুসের সম্পর্ক	৫৪
সংখ্যার আধিক্যের চেয়ে গুণগত মানকে অধাধিকার	৫৮
জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের অধাধিকার নীতি	৭৯
◆ আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনকে অধাধিকার	৭৯
◆ পরিচালনামূলক প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে জ্ঞান পূর্বশর্ত	৮৪
◆ ফতোয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অপরিহার্যতা	৮৭
◆ দাঈ ও শিক্ষকদের জন্য জ্ঞানের অপরিহার্যতা	৯০
◆ মুখস্থকরণের চেয়ে অনুধাবনকে অধাধিকার	৯৩
◆ বাহ্যিক বর্ণনার ওপর মাকাসিদের জ্ঞানকে অধাধিকার	৯৭
◆ তাকলিদের ওপর ইজতিহাদকে অধাধিকার	৯৯
◆ জাগতিক বিষয়ে অধ্যয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণকে অধাধিকার	১০২
◆ ফকিহদের মতামতের ক্ষেত্রে অধাধিকারের নীতিমালা	১০৪
◆ ইসলামের অকাটা এবং সম্ভাব্য বিধানের মধ্যে পার্থক্য	১০৫

ফতোয়া ও দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি	১১৩
◆ সহজতাকে কঠোরতার ওপর অগ্রাধিকার	১১৩
◆ মানুষের জরুরি প্রয়োজনকে মূল্যায়ন	১২২
◆ স্থান ও কালের পরিবর্তনে ফতোয়ার পরিবর্তন	১২৩
◆ তাদাররুজ বা ধারাবাহিক পদ্ধতির অনুসরণ	১২৬
◆ মুসলমানদের জ্ঞানচর্চাকে সংশোধন	১২৯
◆ গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কুরআনের মানহাজ অনুসরণ	১৩১
আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি	১৩৪
◆ নিয়মিত আমলকে অনিয়মিত আমলের ওপর অগ্রাধিকার	১৩৪
◆ মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত আমলকে অগ্রাধিকার	১৩৭
◆ দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলকে অগ্রাধিকার	১৪২
◆ ফিতনার জামানায় নেক আমল করাকে অগ্রাধিকার	১৪৩
◆ অন্তরের আমলকে বাহ্যিক আমলের ওপর অগ্রাধিকার	১৪৬
◆ স্থান-কাল-পাত্রভেদে সর্বোত্তম আমলের মাঝে ভিন্নতা	১৫২
আদেশের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি	১৬৩
◆ মৌলিক বিষয়কে শাখাগত বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার	১৬৩
◆ ফরজকে সুন্নত ও নফলের ওপর অগ্রাধিকার	১৬৮
◆ সুন্নত ও মুতাহাব পালনে শিথিলতা	১৬৯
◆ ফরজের ওপর সুন্নত পালনকে প্রাধান্য...	১৭৩
◆ ইমাম রাগিব (রহ.)-এর মূল্যবান কথা	১৭৫
◆ ফরজে কিফায়ার ওপর ফরজে আইনকে অগ্রাধিকার	১৭৬
◆ ফরজে কিফায়ার মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য	১৭৯
◆ আদ্বাহর হকের ওপর বান্দার হককে অগ্রাধিকার	১৮০
◆ ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর সামষ্টিক অধিকারকে অগ্রাধিকার	১৮৪
◆ ব্যক্তি কিংবা গোত্রপ্ৰীতির ওপর উম্মাহর স্বার্থকে অগ্রাধিকার	১৮৭
◆ ইসলামের বিধানাবলিতে জামাতবদ্ধ জীবনপদ্ধতির শিক্ষা	১৯১

নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলামের অধাধিকার নীতি	১৯৬
◆ আত্মাহকে অস্বীকারের কুফর	১৯৬
◆ শিরক বা অংশীদারত্বের কুফর	১৯৮
◆ আহলে কিতাবদের কুফর	২০০
◆ রিন্দা বা ধর্মত্যাগের কুফর	২০৪
◆ নিফাক বা দ্বিমুখিতার কুফর	২০৭
◆ কুফর, শিরক ও নিফাকের মধ্যে পার্থক্য	২০৯
◆ বড়ো ও ছোটো কুফরির পরিচয়	২১০
◆ ইবনুল কাইয়িম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ	২১৩
◆ বড়ো ও ছোটো শিরকের পরিচয়	২১৬
◆ বড়ো ও ছোটো নিফাকের পরিচয়	২১৮
◆ কবিরাত্তা গুনাহ	২২০
◆ অন্তরের কবিরাত্তা গুনাহ	২২৩
◆ আদম (আ.)-এর পাপ বনাম ইবলিসের পাপ	২২৩
◆ অহংকার	২২৬
◆ হিংসা ও বিদ্বেষ	২২৭
◆ হিংসাত্মক কৃপণতা	২২৯
◆ প্রবৃত্তির অনুসরণ	২৩১
◆ আত্মপ্রশংসা বা আত্মতুষ্টি	২৩৩
◆ লৌকিকতা	২৩৩
◆ দুনিয়ামুখিতা	২৩৬
◆ সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতার মোহ	১৩৭
◆ অন্তরের অন্যান্য কবিরাত্তা গুনাহ	১৩৯
◆ সগিরা বা ছোটো গুনাহ	১৪১
◆ বিশ্বাস ও কর্মের বিদাত্তা	২৫২
◆ গুনাহাত বা সন্দেহপূর্ণ আমল	২৫৮
◆ মাকরুনাহাত বা অপছন্দনীয় আমল	২৬৬
সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামের অধাধিকার নীতি	২৬৮
◆ সমাজ গঠনের পূর্বে ব্যক্তি গঠনকে অধাধিকার	২৬৮
◆ জিহাদের পূর্বে তারবিয়াহকে অধাধিকার	২৭৩

◆ তারবিয়াহ কেন অগ্রাধিকার পাবে	২৮১
◆ চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার	২৮৩
◆ ইসলামি অঙ্গনে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ	২৮৪
◆ কুসংস্কারপূর্ণ চিন্তাধারা	২৮৫
◆ আক্ষরিক চিন্তাধারা	২৮৫
◆ চরমপন্থা ও সহিংসমুখী চিন্তাধারা	২৮৫
◆ ওয়াসাতিয়াহ বা মধ্যপন্থার চিন্তাধারা	২৮৬
◆ ওয়াসাতিয়াহ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৮৮
◆ ইসলামি আইন বাস্তবায়ন নাকি ব্যক্তি ও সমাজ গঠন	২৯৪

প্রাচীন কিতাবাদিতে অগ্রাধিকার ফিকহ ২৯৮

◆ ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মাছি হত্যার প্রসঙ্গ	২৯৮
◆ ফিতনার যুগে সামাজিক সম্পৃক্ততা নাকি নির্জনতাকে প্রাধান্যদান	৩০০
◆ নিষিদ্ধ বিষয়াবলিকে বর্জন নাকি আদেশাবলির অনুসরণ	৩০২
◆ শোকরগুজার ধনী বনাম ধৈর্যশীল গরিব	৩০৫
◆ ইমাম গাজালি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ফিকহ	৩০৯
◆ ধনবান লোকদের শারীরিক ইবাদতের প্রতি বোঝাপ্রবণতা	৩১৩
◆ নফল হজ পাগনে অর্থব্যয় প্রসঙ্গ	৩১৪
◆ আরও যারা অগ্রাধিকার ফিকহ নিয়ে কথা বলেছেন	৩১৫
◆ ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ফিকহ	৩১৬

বর্তমান সময়ের ইসলামি উলামাদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ফিকহ ৩২৪

◆ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব (রহ.)	৩২৪
◆ মুহাম্মাদ আহমাদ আল মাহদি (রহ.)	৩২৫
◆ সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানি (রহ.)	৩২৫
◆ ইমাম মুহাম্মাদ আবদুল হু (রহ.)	৩২৫
◆ ইমাম হাসান আল বান্না (রহ.)	৩২৬
◆ ইমাম আবুল আলা মওদুদী (রহ.)	৩৩০
◆ শহিদ সাইয়েদ কুতুব (রহ.)	৩৩০
◆ ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল মুবারক (রহ.)	৩৩৪
◆ শাইখ মুহাম্মাদ আল গাজালি (রহ.)	৩৩৮

উম্মাহর জন্য অগ্রাধিকার ফিকহ জানার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান ইসলামি জ্ঞানচর্চার ধারাতে ফিকহুল আওলাউইয়্যাৎ (فقه الأولويات) বা অগ্রাধিকার ফিকহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আমার বিভিন্ন লেখনীতে ইতঃপূর্বেই এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে বিভিন্ন কিতাবে এর আলোচনায় বিশেষভাবে আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়াহ বায়নালা জুহুদি ওয়াত তাতাররুফ গ্রন্থে একে ‘ফিকহ মারাতিবিল আমাল’ বা কর্মের স্তরবিন্যাসসংক্রান্ত ফিকহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এসে জ্ঞানচর্চার এ সংযোজনকে আমি ‘ফিকহুল আওলাউইয়্যাৎ’ নামে অভিহিত করেছি।

মৌলিকভাবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—প্রতিটি বিষয়কে তার অবস্থান অনুযায়ী গুরুত্বারোপ করা। সেটি হুকুম-আহকাম, নীতি-নৈতিকতা কিংবা আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে। অর্থাৎ গুরুত্বের বিবেচনায় কাজের স্তরকে বিন্যস্ত করা। আর অবশ্যই সেটি হবে ইসলামের বিশুদ্ধ বর্ণনা ও নীতিমালার আলোকেই নির্ধারিত। ওহির নুরের সাথে আকলের নুরের সমন্বয়ে তা নির্ধারিত হবে। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন—

نُورٌ عَلَى نُّورٍ-

‘নুরের ওপর নুর।’^১

সুতরাং কখনোই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণের ওপর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। একইভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়কে অধিক গ্রহণযোগ্যের ওপর কিংবা নিম্নতম বা মধ্যম অবস্থানকে সর্বোত্তম অবস্থানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

বরং যা প্রাধান্য পাওয়া উচিত, তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর যা কম গুরুত্বপূর্ণ, শেষ পর্যায়ে এসে তা সম্পন্ন করতে হবে। ছোটো বিষয়কে বড়ো করে দেখার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়কে হালকাভাবে নেওয়ারও সুযোগ নেই; বরং প্রতিটি বিষয়কে তার অবস্থান ও গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন কিংবা ভারসাম্যহীনতা পরিহারযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন—

وَالسَّيِّئَاتِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ- أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ-

‘আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িপাল্লা কায়েম করেছেন। এর দাবি হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।’^২

আর তা এজন্য যে, শরিয়াহ প্রণেতার দৃষ্টিতে প্রতিটি আমল কিংবা বিধানের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। সকল কাজকে একই অবস্থান দেওয়া হয়নি। তন্মধ্যে কিছু আমলকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুকে কম গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। কিছু বিষয়কে মৌলিক এবং কিছুকে শাখাগত অবস্থান দেওয়া হয়েছে। কিছু আমলকে ফরজ এবং কিছুকে নফল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমলের তারতম্যের বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন—

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ -

‘হাজিদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামের আবাদ করাকে তোমরা কি তাদের কাজের সমান মনে করো, যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা সমান নয়। জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে, এরাই হলো সফলকাম।’^৩

রাসূল (সা.) বলেন—

‘ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ— এর সাক্ষ্য দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে ফেলা।’^৪

সাহাবায়ে কেরাম সর্বোত্তম আমলের বিষয়ে জানার ব্যাপারে থাকতেন সর্বদা উদগ্রীব, যেন মহান আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হয়। এজন্য দেখা যায়, সর্বোত্তম আমল কিংবা মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় আমলের ব্যাপারে জানতে তাঁরা নবি করিম (সা.)-কে বেশি বেশি প্রশ্ন করতেন।

^২ সূরা আর-রহমান : ৭-৯

^৩ সূরা তাওবা : ১৯-২০

^৪ হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সনদে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারি (রহ.) بضع وستون শব্দ দ্বারা, ইমাম মুসলিম (রহ.) بضع وسبعون শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় بضع وستون শব্দের উল্লেখ এসেছে। এ ছাড়াও ইমাম নাসায়ি (রহ.), আবু দাউদ (রহ.) ও ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁদের সুন্নাহে হাদিসটিকে উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবু জর গিফারি (রা.) এবং অন্য সাহাবিদের জিজ্ঞাসাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর জবাবে নবি করিম (সা.)-ও বলতেন—‘সর্বোত্তম আমল হচ্ছে...’ কিংবা ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে...’^৫

একটি বর্ণনাকে এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

আমর ইবনে আবাসা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল—‘হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী?’ জবাবে তিনি বলেন— ‘আল্লাহর জন্য তোমার অন্তরের আত্মসমর্পণ করা এবং তোমার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে সকল মুসলিমদের নিরাপদ রাখাই হলো ইসলাম।’ তখন লোকটি বলল—‘ইসলামের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?’ নবিজি বললেন— ‘ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া।’

অতঃপর লোকটি বলল—‘ঈমান কী?’ নবিজি বললেন—‘ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা, তাঁর দেওয়া কিতাব, প্রেরিত রাসূলগণ এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।’ তখন সে বলল—‘ঈমানের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?’ নবিজি বললেন—‘হিজরত করা।’

অতঃপর সে বলল—‘হিজরত কী?’ নবিজি বললেন—‘পাপ কাজ থেকে দূরে থাকা।’ তখন সে বলল—‘হিজরতের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?’ নবিজি বললেন—‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’

অতঃপর সে বলল—‘জিহাদ কী?’ নবিজি বললেন—‘যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরদের মুখোমুখি হলে লড়াই করা।’ তখন সে বলল—‘জিহাদের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?’ নবিজি বললেন—‘(যুদ্ধের ক্ষিপ্ততায়) রক্ত গড়িয়ে পড়া এবং কর্তিত অবস্থায় ঘোড়ার মৃত্যুবরণ।’^৬

৫ সর্বোত্তম আমল প্রসঙ্গে সাহাবিদের প্রশ্নের জবাবে নবিজির কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ—

ক. বুখারির বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি নবি করিম (সা.)-এর কাছে এসে বলল—‘হে আল্লাহর রাসূল! সওয়াবের দিক থেকে সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি?’

জবাবে তিনি বললেন—‘সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার সাদাকা করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে এবং ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সাদাকা করতে এ পর্যন্ত দেরি করবে না, যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে—অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু। অথচ তা অমুকের হয়ে গিয়েছে।’ বুখারি, কিতাবুজ-জাকাত : ১৪১৯

খ. আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ থেকে ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, নবি করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—‘কোন জিহাদটি সর্বোত্তম?’

জবাবে তিনি বলেন—أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

‘স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলাই হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।’ আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম : ৪৩৪৪

গ. বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, নবি করিম (সা.)-কে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় আমল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

‘আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো—যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।’ বুখারি, কিতাবুল-লিবাস : ৫৮৬১। মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া কাসরিহা : ১৭১৩

৬ আল মুনজিরি (রহ.) আত-তারগিব ওয়াত তারহিব গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাদিসটি ইমাম আহমাদ (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের বর্ণনাকারীরা প্রত্যেকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

ইমাম হায়সামি (রহ.) বলেন—‘হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম তাবরানি (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবিগণ বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।’

জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার নীতি হচ্ছে—আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দেওয়া। কোনো বিষয়কে জানার পরেই মূলত তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হয়। কারণ, অর্জিত সে জ্ঞান মানুষের কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এক হাদিসে মুয়াজ (রা.) বলেন—

الْعِلْمُ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ-

‘ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে ইমামের মতো। আর আমল হচ্ছে তার অনুসারী।’^৭

বিষয়টির গুরুত্বের কারণে ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর জামিউস-সহিহ গ্রন্থের ইলম অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদকে সন্নিবেশ করেছেন এবং তার শিরোনাম দিয়েছেন—**بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْعَمَلِ** অর্থাৎ ‘কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জনসংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।’

সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেন—এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারি (রহ.) বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো কথা কিংবা কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সে সম্পর্কিত জ্ঞান থাকাটা পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। কারণ, তা নিয়তকে পরিশুদ্ধ এবং কাজকে বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে।

তারা আরও বলেন—কিছু মানুষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তাকে হালকাভাবে নেয়। অজ্ঞতাকে লালন করে নানা প্রকারের আমল বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। আমলের গ্রহণযোগ্যতার সাথে জ্ঞানের গভীর সম্পর্কের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে। তাদের সতর্ককরণের উদ্দেশ্যেই মূলত ইমাম বুখারি (রহ.) এমন শিরোনামে অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন।

ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর শিরোনামের সমর্থনে বেশ কিছু আয়াত ও হাদিসকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -

‘অতএব জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য।’^৮

^৭ ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) এবং অন্যরা বর্ণনাটি মুয়াজ (রা.) থেকে মারফু ও মাওকুফ সনদে উল্লেখ করেছেন। তবে মাওকুফ হওয়ার বিষয়টি অধিকতর বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত।

^৮ সূরা মুহাম্মাদ : ১৯

আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে প্রথমত তাওহীদের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের আদেশ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বলেছেন, যা মূলত আমলের জন্য নির্দেশনাস্বরূপ। এখানে নবিজিকে সম্বোধন করা হলেও তা পুরো মুসলিম উম্মাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ-

‘নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানবানরাই মহান আল্লাহকে ভয় করে।’^৯

আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে—জ্ঞানই মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতির সৃষ্টি করে। মানুষকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

হাদিসের মধ্যে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ-

‘মহান আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন।’^{১০}

কেননা, যখন সে সঠিকভাবে জানতে পারবে, অতঃপর সঠিকভাবে তা মানতে পারবে। আর সর্বোত্তম আমলের মাধ্যমেই কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

আমলের ওপর জ্ঞানার্জনের অগ্রাধিকারবিষয়ক এ মূলনীতিটি কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত নির্দেশনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথম নাজিলকৃত আয়াত হচ্ছে—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-

‘পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’^{১১}

আর পড়া হচ্ছে জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ।

অতঃপর আমলের নির্দেশনা দিয়ে নাজিল হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-

‘হে বস্ত্রাবৃত! ওঠো, অতঃপর সতর্ক করো। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করো।’^{১২}

সুতরাং আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জন সর্বদা প্রাধান্য পাবে। কারণ, তা আকিদাগত বিষয়ে নানা বিভ্রান্তি থেকে হককে পৃথক করে নিতে সহযোগিতা করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাহ ও বিদআতের মাঝে

^৯ সূরা ফাতির : ২৮

^{১০} বুখারি, কিতাবুল ইলম : ৭১

^{১১} সূরা আলাক : ১

^{১২} সূরা মুদাসসির : ১-৪

পার্থক্য বুঝতে সহযোগিতা করে। মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে সহিহ ও ফাসিদ আমলের মাঝে পার্থক্য জানতে পারস্পরিক আচারবিধি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য জানতে সহযোগিতা করে। আখলাকের ক্ষেত্রে, ভালো কাজ ও মন্দ কাজের মাঝে পার্থক্য জানতে সহযোগিতা করে। নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাকবুল ও মারদুদ আমলের মাঝে পার্থক্য জানতে সহযোগিতা করে। সর্বোপরি প্রতিটি কথা ও কাজে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের মানদণ্ডকে তারা অনুধাবন করতে পারে।

এর গুরুত্বের কারণে আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ তাঁদের অসংখ্য কিতাবাদিকে ‘কিতাবুল ইলম’ বা ‘ইলম অধ্যায়’ দিয়ে সূচনা করেছেন। যেমনটা ইমাম গাজালি (রহ.) রচিত বিখ্যাত ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন ও মিনহাজুল আবিদিন গ্রন্থদ্বয়ে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও হাফিজ আল মুনজিরি (রহ.) কিতাবুল ইলমকে প্রথমদিকে স্থান দিয়েছেন। তবে নিয়ত, ইখলাস ও কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের গুরুত্ববিষয়ক হাদিসসমূহকে বর্ণনার পর তিনি এ অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন।

ফিকহুল আওলাউইয়াত বা ইসলামের অগ্রাধিকার নীতির (যা এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়) যথার্থ অনুসরণের ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতা রয়েছে। এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি—কোন কাজটিকে কোন কাজের ওপর প্রাধান্য দিতে হয়। অগ্রাধিকারের এ জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে, তবে প্রতিটি কর্মে অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পাবে।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) কতই-না চমৎকার বলেছেন—

‘যে ব্যক্তি না জেনে কোনো কাজ করে, তার মাধ্যমে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি সংঘটিত হয়।’^{১০}

মুসলিম কিছু দল-উপদলের মাঝে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে দেখা দেয়। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আল্লাহভীতি কিংবা জজবার ক্ষেত্রে তাদের কোনো কমতি থাকে না। শুধু ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে তারা বিচ্যুতির দিকে ধাবিত হন।

^{১০} পড়ুন : ইবনে আবদুল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ; বৈরুত, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৭

আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

নিয়মিত আমলকে অনিয়মিত আমলের ওপর অগ্রাধিকার

কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়—মহান আল্লাহর কাছে বান্দার সকল আমল সমপর্যায়ের নয়। তন্মধ্যে কিছু আমল তাঁর কাছে অন্যান্য আমলের চেয়ে অধিক প্রিয়।

যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন—

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ -

‘হাজিদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামের আবাদ করাকে তোমরা কি তাঁদের কাজের সমান মনে করো, যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা সমান নয়। জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে, এরাই হলো সফলকাম।’^{১৪}

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

‘ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের সাক্ষ্য দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে ফেলা।’^{১৫}

হাদিসটিও নির্দেশ করে, ঈমানের শাখা-প্রশাখাসমূহের মাঝে রয়েছে নানাবিধ স্তর। মর্যাদা ও সওয়াবের দিক থেকে সব একই পর্যায়ের নয়।

আমলের মাঝে এ ভিন্নতা উদ্দেশ্যহীনভাবে নির্ণীত হয় না। অবশ্যই কিছু মূলনীতির আলোকেই তা নির্ধারণ করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সে মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

^{১৪} সূরা তাওবা : ১৯-২০

^{১৫} মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ৩৫

তন্মধ্যে অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে—আমালুদ দায়িম বা নিয়মিত আমল অধিক মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ যে কাজ মানুষ নিয়মিতভাবে পালন করে, তা বিচ্ছিন্নভাবে পালনকৃত আমলের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত।

এ মূলনীতির সমর্থনে রাসূল (সা.) বলেন—

‘আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো—যা সর্বদা নিয়মিত করা হয়; যদিও তা অল্প হয়।’^{১৬}

মাসরুফ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—‘আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবি করিম (সা.)-এর নিকট কোন আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল? তিনি বলেন, নিয়মিত আমল।’^{১৭}

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

‘একবার নবি করিম (সা.) তাঁর নিকট আগমন করলেন। এমতাবস্থায় একজন মহিলা তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কে? আয়িশা (রা.) উত্তরে বললেন—অমুক মহিলা। এই কথা বলে তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন (অর্থাৎ মহিলাটির অধিক সালাত ও ইবাদতের প্রশংসা করলেন)।

আল্লাহর রাসূল (সা.) তখন বললেন—খামো। তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখো, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল সেটাই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।’^{১৮}

আরবিতে ৫৬ শব্দটি সাধারণত ধর্মকের সুরে ব্যবহৃত হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজেকে কষ্ট দেওয়া কিংবা সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে তা আদায়ের প্রশ্নে নবিজি এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর তা এজন্য—নিয়মিত আমল (তা অল্প হলেও) আল্লাহর প্রতি সার্বক্ষণিক আনুগত্যকে প্রকাশ করে এবং অধিক বরকত নিয়ে আসে। বিচ্ছিন্নভাবে পালনকৃত অধিক আমলের চেয়ে তা কয়েকগুণ বরকতপূর্ণ হতে পারে।

রাসূল (সা.) দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা নিষেধ করেছেন—যাতে একপর্যায়ে এসে মানুষের আগ্রহে ঘাটতি দেখা না যায় এবং আমলের ব্যাপারে তারা বিরক্ত না হয়। অতঃপর মাঝপথে এসে তারা আমল পরিত্যাগ করবে।

এক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর পরামর্শ হচ্ছে—

‘তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখো, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। মহান আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো।’^{১৯}

^{১৬} মুসলিম, কিতাবুল মাসাজ্জিদি ওয়া মাওদিইস সালাত : ৭৮৩

^{১৭} বুখারি, কিতাবুত তাহাজ্জুদি বিল লাইল : ১১৩২

^{১৮} বুখারি, কিতাবুল ঈমান : ৪৩

^{১৯} মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আয়িশা : ২৬০৭৬

অন্যত্র তিনি বলেন—

‘তোমাদের মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করা উচিত। কেননা, দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর জয়ী হয়।’^{২০}

এ হাদিসের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় বুরাইদা আল আসলামি (রা.) বলেন—একদা আমি হাঁটছিলাম। এমন সময় নবি করিম (সা.)-কে দেখতে পেলাম। নিজেকে তাঁর কোনো খেদমতে কাজে লাগানোর অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমরা সকলে হাঁটতে লাগলাম। এমতাবস্থায় আমরা এক ব্যক্তিকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পেলাম, যিনি অধিক পরিমাণে রুকু ও সিজদা করছিলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন— তোমরা কি তার আমলকে লোকদেখানো মনে করো? আমি বললাম—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

রাসূল (সা.) তখন আমার হাত ছেড়ে দেন এবং নিজের দুই হাত উঁচু করে ধরে বলেন—‘তোমাদের মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করা উচিত। কারণ, দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর জয়ী হয়।’^{২১}

সাহল ইবনে হুнайফ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন— নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপের কারণেই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। আর তাদের অবশিষ্টদের তুমি উপাসনালয়ের ভেতরেই খুঁজে পাবে (অর্থাৎ, কঠোরতার কারণে মানুষ তাদের বর্জন করবে এবং তাদের ধর্মচর্চা উপাসনালয়ের অভ্যন্তরেই আবদ্ধ হয়ে যাবে)।^{২২}

মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত আমলকে অগ্রাধিকার

আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের অন্যতম অগ্রাধিকার নীতি হচ্ছে—মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত আমলকে ব্যক্তিগত আমলের ওপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া। কাজের মাধ্যমে মানুষের যত বেশি কল্যাণ সাধন করা যায়, তত বেশি পরিমাণ সওয়াব ও মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জন করা সম্ভব। এজন্য দেখা যায়—কুরআনে জিহাদের কার্যাবলিকে হজের কার্যাবলির চাইতে উত্তম বলা হয়েছে। কেননা, হজ পালনের উপকারিতা শুধু তার আদায়কারী ভোগ করে। কিন্তু জিহাদের সুফল পুরো মুসলিম উম্মাহ ভোগ করে থাকে।

^{২০} মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদুল আনসার : ২৩০৫৩

^{২১} মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদুল আনসার. ২২৯৬৩

^{২২} ইমাম হায়সামি (রহ.) বলেন, হাদিসটি ইমাম তাবরানি (রহ.) মুজামুল আওসাত এবং মুজামুল কাবিরে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন : মাজমাউজ জাওয়াইদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, পৃ.-৬২

আদেশের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

মৌলিক বিষয়কে শাখাগত বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার

ইসলামি শরিয়াহর নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে— উসুল বা মৌলিক বিষয়কে ফুরূ বা শাখাগত বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

ইসলামের উসুল বলতে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে—বিশ্বাসগত বিষয়াবলি। অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ, ফেরেশতা, রাসূল, কিতাব, পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। আরকানুল ঈমান বা বিশ্বাসের মৌলিক এ রুকনগুলো নিয়ে পবিত্র কুরআন বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন—

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ-

‘ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং ভালো কাজ হলো—যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবসে, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবিগণের প্রতি।’^{২৩}

অন্যত্র তিনি বলেন—

أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ-

‘রাসূল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে—আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমাপ্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই (আমাদের) প্রত্যাবর্তনস্থল।’^{২৪}

^{২৩} সূরা বাকারা : ১৭৭

^{২৪} সূরা বাকারা : ২৮৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর নাজিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি, যা তিনি পূর্বে নাজিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।’^{২৫}

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে উসুলুল আকিদার আলোচনায় তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসকে উল্লেখ করা হয়নি। তাকদিরের বিষয়টি মূলত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সৃষ্টিজগতের কদরের জ্ঞান মহান আল্লাহর কামালিয়াতকেই প্রকাশ করে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের ব্যাপকতা ও ক্ষমতার পরিধিকে বিশ্লেষণ করে।

সুতরাং আকিদা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক অংশ এবং শরিয়াহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা। অন্য কথায়, ঈমান হচ্ছে মৌলিক এবং আমল হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা।

ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক নিয়ে কালামশাস্ত্রবিদগণ ব্যাপক মতপার্থক্য করেছেন। যেমন : আমল কি ঈমানের অংশ নাকি তার বহিঃপ্রকাশ? ঈমানের শুদ্ধতার জন্য আমল কি শর্ত নাকি তার পূর্ণতার দলিল? এসব তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়।

সারকথা হচ্ছে—সত্যিকারের ঈমান মানুষকে আমলের দিকে ধাবিত করে। ঈমানের শুদ্ধতা ও দৃঢ়তার ওপর ভিত্তি করেই ঘটে আমলের বহিঃপ্রকাশ। সেটি আদেশ ও নিষেধ উভয়ই হতে পারে।

আর আমল যত বেশিই হোক না কেন—তা যদি ঈমানের ভিত্তিমূলের ওপর স্থাপিত না হয়, তবে আল্লাহর দরবারে তা কোনো কাজে আসবে না। যার চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ-

‘আর যারা কুফরি করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে—সেটি কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।’^{২৬}

এজন্য সবকিছুর ওপরে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত—আকিদা বিশুদ্ধকরণ। সমাজে প্রচলিত সকল প্রকার শিরক ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের

^{২৫} সূরা নিসা : ১৩৬

^{২৬} সূরা নূর : ৩৯

বীজ বপন করতে হবে। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তক্রমে এটি নানা প্রকার ফল-ফলাদি দ্বারা জীবনের আঙিনা সমৃদ্ধ করে দেবে।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নামক কালিমার এ মর্মবাণী আমাদের অস্তিত্বকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলে। আমাদের জীবনের প্রতিটি আঙিনা আলোকিত করে। সমূলে উৎপাটিত করে চিন্তা ও আচরণগত সকল জাহেলিয়াত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

জেনে রেখো, অন্তরের মধ্যে প্রোথিত ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর রৌশনির শক্তি কিংবা দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে তা আমলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তা হচ্ছে মূলত নুর, যা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে।

কিছু মানুষ আছে, এই কালিমা যাদের অন্তরে আলোকোজ্জ্বল সূর্যের মতো।

কিছু মানুষ আছে, এই কালিমা যাদের অন্তরে প্রদীপ্ত নক্ষত্রের মতো আলোকোজ্জ্বল।

কিছু মানুষ আছে, এই কালিমা যাদের অন্তরে প্রদীপ্ত মশালের ন্যায়।

আর কিছু মানুষ আছে, এই কালিমা যাদের অন্তরে বাতির মতো আলো বিস্তার করে।

এজন্য কিয়ামতের অন্ধকার বিভীষিকাময় দিনে মানুষের অন্তরে থাকা কালিমার এ নুরের অবস্থান ও পরিধি অনুযায়ী তা আলো বিস্তার করবে। ঈমান ও আমলের মাধ্যমে যে যতটুকু পরিমাণ নুর সংগ্রহ করেছে, সেদিন তার আশেপাশে ততটুকুই কাজে আসবে।

এই কালিমার নুর অন্তরের মধ্যে যত গভীর এবং ব্যাপকভাবে অবস্থান করবে, চিন্তা ও বিশ্বাসগত যাবতীয় কুসংস্কার ও বিভ্রান্তি তত বেশি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। একপর্যায়ে বিশ্বাসের নুর এমন অবস্থানে পৌঁছবে যে, সকল বিভ্রান্তি ও প্রবৃত্তিকে তা সহজেই নিঃশেষ করে দিতে পারবে। এটাই হচ্ছে তাওহীদের ওপর বিশ্বাসের সঠিক অবস্থান, যেখানে কোনো অংশীদারত্ব কিংবা বিভ্রান্তি জায়গা নিতে পারে না।

তাওহীদের এ অবস্থানটি বুঝলে আমরা নিম্নোক্ত হাদিসটি সহজেই অনুধাবন করতে পারব। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ-

‘মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন—যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।’^{২৭}

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন—যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দেবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।^{২৮}

নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

আদেশ পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি নিয়ে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। এসবের মর্যাদা ও অবস্থানগত নানা ভিন্নতার বিষয়গুলো সেখানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। নফল, সুন্নত, ওয়াজিব ও ফরজের মাঝে পারস্পরিক তারতম্য এবং অগ্রাধিকারের নীতিমালা নিয়ে দলিলভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ে ইসলাম নির্ধারিত নিষেধাবলির বিষয়ে আমরা আলোকপাত করতে চাই। আর এটি অত্যন্ত স্পষ্ট, সকল নিষেধ একই স্তরের নয়। এসবের মাঝেও রয়েছে অবস্থানগত তারতম্য। যেমন : আল্লাহর সাথে কুফরি করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কিছু বর্জনীয় আমল আছে, যা মাকরু বা অপছন্দনীয় স্তরের কিংবা خلاف الأولى বা উত্তমতার বিপরীত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুফরকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ হিসেবে নির্ধারণ করা হলেও এর মাঝে আবার রয়েছে নানাবিধ স্তরবিন্যাস।

আল্লাহকে অস্বীকারের কুফর

নাস্তিক্যবাদ কিংবা অস্বীকারের কুফর হচ্ছে—এ বিশ্বজাহানের পরিচালক হিসেবে একজন স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার। তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফেরেশতাদের বিশাল অস্তিত্ব এবং কর্মযজ্ঞকে অস্বীকার করা। মানবগোষ্ঠীর হিদায়াতের জন্য প্রেরিত নবি-রাসূল এবং কিতাবাদির বিষয়কে অস্বীকার। এ ছাড়াও মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা হিসেবে আখিরাত বা মৃত্যুপরবর্তী দিবসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

মূলকথা হচ্ছে—ইসলামি আকিদার মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের মতো বিশ্বাসগত ভিত্তিমূলকে চরমভাবে অবজ্ঞা করে। জীবনকে কোনো প্রকার বিশ্বাসের সাথেই আবদ্ধ রাখতে চায় না তারা। কেবল চাক্ষুষ দুনিয়াতেই বিশ্বাস করে এবং তাদের বিশ্বাসগত পূর্বপুরুষদের ন্যায় বলে—

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثٍ

‘আর তারা বলেছিল, আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হব না।’^{২৯}

^{২৮} মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ৯১

^{২৯} সূরা আনআম : ২৯

তাদের কেউ কেউ এভাবে বলে—‘মায়ের জরায়ু থেকে আমাদের আগমন এবং পৃথিবীর মাটিতেই আমাদের প্রস্থান। এরপর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।’

প্রতিটি যুগের বস্তুবাদীরা মূলত এমন কুফরি বিশ্বাস ধারণ করত। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও চিন্তাধারাও এ বিশ্বাসের ওপর গঠিত। তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক দুটি স্লোগান হচ্ছে—স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাস ও বস্তুবাদিতা; যদিও পরবর্তী সময়ে তাদের মানবীয় এই আদর্শ ও বিশ্বাসের পতন ঘটেছে।

তাদের দৃষ্টিতে দীন হচ্ছে কুসংস্কারের সমষ্টি। এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইবাদত হচ্ছে কল্পিত কিছু রূপকথা মাত্র। তারা মূলত পূর্ববর্তী যুগের বস্তুবাদী দার্শনিকদের সুরেই কথা বলতে চেষ্টা করে। সেই সব বস্তুবাদী দার্শনিক বলত—‘আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছে, এটা সঠিক নয় (যেমনটা বিশ্বাসীরা ধারণা করে থাকে); বরং সত্য হচ্ছে—মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে!’

কত বড়ো বিভ্রান্ত চিন্তা থেকে এমন বক্তব্য আসতে পারে চিন্তা করা যায়? সুস্থ বিবেক ও প্রশান্ত অন্তর চরমভাবে এ মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ইতিহাসের বাস্তবতাও বিষয়টি মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এ ছাড়াও প্রতিটি সৃষ্টিকর্মের নির্দেশনা সর্বতোভাবে প্রমাণ করে একজন স্রষ্টার অস্তিত্বকে।

ওহির বর্ণনা (যা মূলত বস্তুবাদীরা অস্বীকার করে থাকে) বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا-

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।’^{৩০}

আর এ প্রকার কুফর হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ গুনাহ।

শিরক বা অংশীদারত্বের কুফর

অস্বীকারের কুফরের পর অংশীদারত্বের কুফর হচ্ছে ভয়াবহ গুনাহ। জাহেলি যুগে আরবরা মূলত এ ধরনের কুফরিতে বিশ্বাস স্থাপন করত। তারা মূলত এক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করত। আসমান, জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিত আল্লাহর রুবুবিয়াতকে। আল্লাহকে স্বীকার করত জীবন, মৃত্যু ও রিজিক প্রদানের একক ক্ষমতাধর হিসেবে। সকল সৃষ্টিকে যথাযথভাবে পরিচালনায় মহান আল্লাহর ক্ষমতার পরিধির ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করত। এককথায় তারা পূর্ণ আস্থা পোষণ করত তাওহিদুল রুবুবিয়াতের ওপর।

সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

সমাজ গঠনের পূর্বে ব্যক্তি গঠনকে অগ্রাধিকার

ইসলাহ বা সংশোধনমূলক কাজের ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে— সমাজ গঠনের পূর্বে ব্যক্তি গঠনকে প্রাধান্য দেওয়া। সংগঠন কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সংস্কারের পূর্বে তার কর্মীদের মাঝে সংস্কারের প্রয়াস চালানো।

ব্যক্তি গঠনের গুরুত্ব এবং প্রাধান্যতার বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

‘নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।’^{৩১}

এটিই হচ্ছে সকল প্রকার সামাজিক সংশোধন, সংস্কার ও পরিবর্তনের মৌলিক নীতিমালা। অর্থাৎ, ব্যক্তির মাধ্যমে পরিবর্তনের সূচনা করা। কেননা, দুর্বল ইট ও পাথরের মাধ্যমে কখনোই একটি টেকসই দালান কল্পনা করা যায় না।

সমাজ নামক এ দালানের মাঝে প্রত্যেক মানুষ একেকটি ইটের ভূমিকা পালন করে। এজন্য সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পূর্বে এর প্রত্যেক অধিবাসীকে ইসলামি তারবিয়াহ ও তামাদ্দুনের আলোকে সাজিয়ে নিতে হবে। তাদের পরিবর্তনই ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তনের পথকে সুগম করবে।

সৎকর্মশীল ব্যক্তি গঠনকে প্রাধান্য দেওয়া ছিল মূলত নবি-রাসূলদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দাওয়াতি মানহাজ। অতঃপর নবিদের দাওয়াতি ওয়ারিশরাও এ মানহাজকে গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করেছেন।

ব্যক্তি গঠনের ক্ষেত্রে আবার সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে ঈমান গঠনকে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ আকিদার বীজ ব্যক্তির অন্তরে রোপণ করতে হবে, যার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যাপারে তার মাঝে জন্মলাভ করবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ মহাবিশ্ব, মানবসমাজ, জীবনপদ্ধতি এবং এসবের স্রষ্টার ব্যাপারে দূরীভূত হয়ে যাবে সকল ভ্রান্তি ও সন্দেহ। মানুষ তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ চলা সম্পর্কে জানতে পারবে। সে খুঁজে পাবে জীবন ও জগতের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অতঃপর নাস্তিক কিংবা অ্যাগনস্টিক মস্তিষ্কের যাবতীয় প্রশ্ন ও আপত্তির জবাব দিতে তারা সক্ষম হবে—আমি কে? আমি কোথা হতে এসেছি? আমি কোথায় যাব? আমি কেন এ পৃথিবীতে এসেছি? জীবন ও মৃত্যু আসলে কী? জীবনের পূর্বে কী ছিল? মৃত্যুর পর কী হবে? এ মহাবিশ্বের প্রতি আমার করণীয় কী?

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনই কেবল মানুষের জীবন ও জগৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব প্রদানের সক্ষমতা রাখে। মৌলিক ভূমিকা পালন করে মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণে। আর ঈমান ছাড়া প্রকৃত অর্থে মানুষের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। তাদের জীবন হয়ে যায় ধূলিকণার মতো মূল্যহীন। শারীরিক শক্তিমত্তা কিংবা বিশাল অবয়ব সত্ত্বেও মহাবিশ্বের বিশালতার সামনে সে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। দীর্ঘায়ু লাভ করা সত্ত্বেও কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় সে হয়ে যায় মূল্যহীন।

ঈমানই কেবল সফলতার গল্প রচনা করতে পারে। একে ধারণ করার মাধ্যমেই মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে পরিবর্তন ও জাগরণ।

মানুষকে কখনোই পশুর মতো হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কিংবা লোহা, তামা ও অন্যান্য ধাতুর মতো গলিয়ে রূপদান করাও অসম্ভব।

তাকে পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে—তার চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির মাঝে পরিবর্তন সাধন করা। আকল ও কুলবের এ পরিবর্তন তাকে সত্যের পথযাত্রী হতে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সম্ভ্রষ্টচিত্তে গ্রহণে প্রেরণা জোগাবে। কল্যাণকর প্রতিটি কাজে আনন্দদান এবং পাপাচার থেকে সাধ্যমতো পরহেজের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

ঈমান মানুষের মাঝে এ প্রবল মানসিক শক্তির জোগান দেয়। তখন সে এক ভিন্ন অস্তিত্ব লাভ করে। নতুন স্পিরিট ও দৃঢ়তা নিয়ে অবস্থান করে সত্যের পথে। নতুন চিন্তা ও দর্শনকে ধারণ করে জীবনের গতিপথকে নির্ধারণ করে।

যেমনটা আমরা ফেরাউনের জাদুকরদের ঘটনা বিশ্লেষণে দেখতে পাই। মুসা ও হারুন (আ.)-এর রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাদের মাঝে এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, ফেরাউনের যাবতীয় ভীতি প্রদর্শন তাদের বিশ্বাসগত অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি। তারা বরং উচ্চৈঃস্বরে এ কথার ঘোষণা দিয়েছিল—

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا-

‘সুতরাং তুমি যা ফয়সালা করতে চাও তা-ই করো। তুমি তো কেবল এ দুনিয়ার জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারো।’^{৩২}

এ ছাড়াও আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁদের জাহেলিয়াত থেকে ধাবিত করেছিল ইসলামের দিকে। মূর্তিপূজা ও মেষপালনভিত্তিক জীবনপদ্ধতি থেকে পুরো মানবগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল। সমবেত করেছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনপদ্ধতি থেকে আলোর মোহনায়।